# হযরত মুহম্মদ (স.)-এর জীবনে মদিনা নগরীর গুরুত্ব : একটি পর্যালোচনা

**লুকনা ইয়াসমিন***

**সারসংক্ষেপ :** হযরত মুহম্মদ (স.) ৫৭০ সালে বর্তমান সৌদি আরবের মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। ৬১৩ সালে হযরত মুহম্মদ (স.) মক্কায় ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেন। মক্কায় ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে হযরত মুহম্মদ (স.) ইসলাম বিরোধীদের দ্বারা প্রবলভাবে বাধাগ্রস্ত হন। তাঁর নিজের জীবন এবং তাঁর অনুসারীদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য এবং সর্বোপরি ইসলাম ধর্ম প্রচারের স্বার্থে তিনি ৬২২ সালে মক্কা থেকে ৩০০ মাইল দূরবর্তী মদিনায় হিযরত করেন । তিনি তাঁর বাষট্টি বছরের জীবনকালের শেষ দশ বছর মদিনায় ছিলেন। কিন্তু এই দশ বছরের মদিনা জীবনই তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় সাফল্যগুলো এনে দিয়েছিল। মদিনা সনদের মাধ্যমে তিনি মদিনায় এক উম্মাহ্ গঠন করেন এবং এই মদিনা সনদই তাঁকে উক্ত উম্মাহ'র আইন প্রণয়নকারী, প্রধান বিচারক, সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক সর্বোপরি উম্মাহ্'র শাসকে পরিণত করে। বিপুল কর্মযজ্ঞ, ব্যাপক প্রভাব-প্রতিপত্তি, অনন্যসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা, ব্যাপক সাফল্য এবং ইসলাম ধর্মের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার কারণে মাত্র ১০ বছরের মদিনা জীবন ৫২ বছরের দীর্ঘ মক্কা জীবনকে সবদিক দিয়ে অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাঁর দশ বছরের মদিনা জীবন তাঁর সকল সাফল্যের ভিত্তি স্থাপন করে। বর্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (স.) ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য পবিত্র মদিনা নগরীর অধিবাসীদের কাছ থেকে ব্যাপক সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। হযরত মুহম্মদ (স.) তাঁর নিজ মাতৃভূমি মক্কায় ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে অমানবিক নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন। নিজ জন্মভূমিতে লাঞ্ছিত, নির্যাতিত হয়ে তিনি যখন গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হন তখন মদিনা নগরীর কিছু প্রভাবশালী মানুষ নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে তাঁকে ধর্ম প্রচারের জন্য মদিনায় গমনের আমন্ত্রণ জানান। তাঁদের সহযোগিতার আশ্বাস পেয়েই মুহম্মদ (স.) ৬২২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর মদিনায় হিযরত করেন এবং নির্বিঘ্নে ইসলাম ধর্ম প্রচারের অপূর্ব সুযোগ লাভ করেন। মুহম্মদ (স.) এই মদিনাতেই ৬৩২ সালের ৮ জুন ৬২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মক্কায় তাঁর এবং নবদীক্ষিত মুসলমানদের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। কিন্তু মদিনায় গমনের পর থেকে তাঁর এবং তাঁর অনুসারীদের জীবন পূর্বের তুলনায় নিরাপদ হয় এবং মুসলমানরা খুব দ্রুততার সাথে একটি শক্তিশালী, প্রভাবশালী ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।



হয়। মদিনায় নিরাপদ আশ্রয় লাভ করে তিনি শুধু ধর্ম প্রচারের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি মদিনার প্রভাবশালী কয়েকটি গোত্রের আন্তরিক সম্মতিতে মদিনার শাসন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সততা, নিষ্ঠা ও নির্ভীকতার সাথে অস্থিতিশীল মদিনায় শান্তি এবং স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করেন। মদিনা নগরীর অধিবাসীদের উদারতা ও বদান্যতার কারণে তিনি ইসলাম ধর্মকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং মদিনার শাসক হবার কারণে তিনি ব্যাপক প্রভাব ও শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন এবং ৬৩০ সালে মক্কা জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি মক্কা, মদিনাসহ বেশ কিছু অঞ্চলের শাসক হয়েছিলেন। মদিনা নগরীতে তাঁর গমন তাঁর জীবনের একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। মদিনা তাঁকে দিয়েছিল ইসলাম ধর্ম প্রচারের নির্বিঘ্ন পরিবেশ, মদিনাবাসী তাঁকে দিয়েছিল মদিনা শাসন করার অধিকার এবং এই মদিনা থেকে পরবর্তীকালে মুসলমানরা ইসলাম ধর্মকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেবার সুযোগ লাভ করেছিল। মুহম্মদ (স.)-এর জীবনে মদিনা নগরীর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধটি রচিত। মুহম্মদ (স.)-এর জীবনী, ইসলাম ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে যেসব মৌলিক গবেষণা হয়েছে, সেসব মৌলিক গবেষণা গ্রন্থের তথ্য বিশ্লেষণ করে উক্ত প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে।

হযরত মুহম্মদ (স.)-এর জীবনে মদিনা নগরীর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে হলে প্রথমেই তাঁর মক্কা থেকে মদিনায় গমনের পটভূমি বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। মুহম্মদ (স.)-এর মক্কা জীবন ৫২ বছর স্থায়ী অর্থাৎ তাঁর জন্ম সন ৫৭০ সাল থেকে তাঁর মদিনা গমনের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ৬২২ সাল পর্যন্ত। ৬১৩ সালে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেন এবং শুরু থেকেই তিনি মক্কার প্রভাবশালী সম্প্রদায় কর্তৃক প্রবল বাধার সম্মুখীন হন (Guillaume, 1955 : 130, al-Tabari, 1988 : 88)। পৌত্তলিকতার প্রতি গভীর বিশ্বাস, কা'বা কেন্দ্রিক ধর্মব্যবসায় নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি নষ্ট হবার ভয়ে ভীত হয়ে তাঁরা ইসলাম ধর্মের বিরোধিতা শুরু করে (Armstrong, 1991 : 72, al-Tabari, 1988 : 93)। তাঁরা নবদীক্ষিত মুসলমানদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন শুরু করে। মুসলমানদের ওপর নিপীড়ন এমনভাবে বেড়ে যায় যে ৬১৫ সালে ৮৩টি মুসলিম পরিবার আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) চলে যেতে বাধ্য হয় (কাসীর, ২০০০ : ৩৯৯)। ৬১৬ সালে মুহম্মদ (স.) ও তাঁর অনুসারীদের সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হয় (Watt, 1953 : 119)। সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর তিনি তাঁর গোত্রের অনুসারীদের নিয়ে মক্কার উপকণ্ঠে তাঁর পিতৃব্য আবু তালিবের মালিকানাধীন একটি পর্বত পরিবেষ্টিত স্থানে (স্থানটি আবু তালিবের গিরি-সংকট নামে পরিচিত) তিন বছর মানবেতর জীবন যাপন করেন। তিন বছর পর মক্কার কিছু বিবেকবান সাহসী তরুণের প্রচেষ্টার ফলে মুসলমানদের ওপর থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহৃত হয় (al-Tabari, 1988 : 112)। ৬১৯ সালে মুহম্মদ (স.) যখন গিরি-সংকট থেকে সমাজে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় দুর্যোগ তাঁর জন্য অপেক্ষা

করছিল। তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার কিছুদিনের মধ্যে তাঁর সহধর্মিনী হযরত খাজিদা (রা.) এবং পিতৃব্য আবু তালিব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর ইসলাম ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছিলেন তাঁর মহীয়সী সহধর্মিনী হযরত খাদিজা (রা.) এবং পিতৃব্য আবু তালিব, যিনি হাশিম গোত্রের গোত্রপতি ছিলেন। মুহম্মদ (স.) এবং আবু তালিব বনু হাশিম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য হযরত খাজিদা (রা.) তাঁর অর্থ দিয়ে, তাঁর মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে মুহম্মদ (স.)কে সহযোগিতা করেছেন। আবু তালিব বনু হাশিম গোত্রের গোত্রপতি হিসেবে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র মুহম্মদ (স.)কে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারে সবদিক দিয়ে সাহায্য করেছেন। ফলে হযরত খাদিজা (রা.) এবং আবু তালিবের মৃত্যু মুহম্মদ (স.)-এর জীবনে ছিল এক অপূরণীয় ক্ষতি, যেজন্য মুহম্মদ (স.) ৬১৯ সালকে তাঁর জীবনের দুঃখ যন্ত্রণার বছর হিসেবে আখ্যায়িত করে গেছেন (Lings, 1983 : 96, Muir, 1861 : 195)। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আবু তালিব এবং মুহম্মদ (স.) বনু হাশিম গোত্রের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। বনু হাশিম গোত্রের গোত্রপতি মহান আবু তালিবের মৃত্যুর পর হাশিম গোত্রের গোত্রপতি হন মুহম্মদ (স.)-এর অপর এক চাচা আবু লাহাব। ইসলাম-বিদ্বেষী আবু লাহাব হাশিম গোত্রের গোত্রপতি হয়েই মুহম্মদ (স.)-এর গোত্রীয় নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেন (Lings : 118)। সে সময় আরবের প্রতিটি মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য কোনো না কোনো গোত্রের নিরাপত্তায় থাকতে হতো। আবু লাহাব যখন মুহম্মদ (স.)-এর গোত্রীয় নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেন, তখন মুহম্মদ (স.) গোত্রহীন হয়ে পড়েন এবং কারণে তাঁর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। গোত্রহীন হয়ে পড়ার কারণে মুহম্মদ (স.) কে হত্যার ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায়। যেজন্য আত্মরক্ষার তাগিদে এবং ইসলাম ধর্মের প্রচার অব্যাহত রাখতে কোন উপায় না পেয়ে তিনি প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ৬২২ সালের শেষের দিকে মক্কায় অবস্থান করা তাঁর পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে তিনি মক্কা থেকে মদিনায় গমন করতে বাধ্য হন। মদিনা গমন করার কারণ হলো, এই নগরীর দুটি প্রভাবশালী গোত্র বনু আওস গোত্র এবং বনু খাজরাজ গোত্র মুহম্মদ (স.)-এর নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছিল। এভাবেই শুরু হয় মুহম্মদ (স.)-এর মদিনা জীবন। ঐতিহাসিক পি. কে হিট্টি'র মতে, মদিনায় হিজরত মুহম্মদ (স.)-এর জীবনের একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা ছিল। এই মদিনাতেই ধর্ম প্রচারক ও মদিনার শাসক হিসেবে হযরত মুহম্মদ (স.)-এর এক নতুন জীবন শুরু হয়েছিল — যা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত (Tabari : 150, Hitti, 1958 : 116, Muir : 213)।

মক্কার ৩০০ মাইল উত্তরে মদিনার অবস্থান। মুহাম্মদ (স.)-এর মদিনা গমনের পূর্বে মদিনা নগরী 'ইয়াসরিব' নামে পরিচিত ছিল। মদিনা হলো একটি প্রকৃত মরুদ্যান। এখানে প্রচুর খেজুর উৎপন্ন হতো। এখানে বেশ কিছু ইহুদি গোত্র ও অ-ইহুদি গোত্র বাস করত। ইহুদি গোত্রগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী গোত্র ছিল বনু নাদির গোত্র



ও বনু কুরাইজা গোত্র। তাঁরা 'ইয়াসরিব'-কে একটি কৃষিভিত্তিক কেন্দ্রে পরিণত করেছিল। তাঁদের পুর্ব পুরুষরা প্যালেস্টাইনের আদিবাসী ছিলেন। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে যখন রোমানরা প্যালেস্টাইন দখল করে নেয় তখনই এই মানুষগুলোর পূর্বপুরুষরা প্যালেস্টাইন থেকে পালিয়ে তদানীন্তন ইয়াসরিব-এ আশ্রয় নেয় এবং এখানেই থেকে যায়। অ-ইহুদি গোত্রের মধ্যে বনু আওস গোত্র ও বনু খাজরাজ গোত্র ইয়েমেন থেকে ইয়াসরিব-এ এসেছিল (Hitti : 104)। ৬২২ সাল পর্যন্ত এ শহরটি ইয়াসরিব নামে পরিচিত ছিল। ৬২২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর মুহাম্মদ (স:) মক্কা থেকে ইয়াসরিব-এ গমন করেন। ইসলামের ইতিহাসে এই ঘটনা 'হিজরত' নামে পরিচিত। মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পর ধীরে ধীরে এই শহর হয়ে ওঠে তাঁর মূল কর্মক্ষেত্র এবং তিনি এই শহরের এক অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন। ইয়াসরিব-এর ইহুদিরা ছিল শক্তিশালী সম্প্রদায়। তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া মুহম্মদ (স.)-এর পক্ষে ইয়াসরিবে ধর্ম প্রচার ও শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব ছিল না। মুহম্মদ (স.) ইয়াসরিব-এ গমনের পর থেকে ইহুদিদের বিভিন্ন ধর্মীয় বিধি-বিধান ও রেওয়াজ-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কিছু ইসলামিক রেওয়াজ চালু করেন। তিনি ইহুদিদের এরকম একটি বার্তা দিতে চেয়েছিলেন যে ইহুদিদের বিভিন্ন রেওয়াজ-এর প্রতি মুসলমানরা শ্রদ্ধাশীল। ইহুদিরা ইয়াসরিবকে 'মেদিনেতা' নামে অভিহিত করত। যার আক্ষরিক অর্থ হলো নগর। সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে ইহুদিদের সাথে কিছু কিছু বিষয়ে একাত্মতা সৃষ্টি করতে এবং তাঁদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য মুহম্মদ (স.) ইহুদিদের 'মেদিনেতা' নামটিকে আরবীয়করণ করে তিনি নাম রাখেন 'আল-মদিনাত' — পরে 'আল মদিনাত' সংক্ষেপিত হয়ে 'মদিনা' নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে (Armstrong : 149)।

৬২২ সালের শেষার্ধে মদিনা যেন ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। মুহম্মদ (স.) যখন মদিনায় গমন করেন তখন মদিনা ছিল অস্থিতিশীল এক নগরী — যেখানে বিভিন্ন গোত্র সহিংস অবস্থায় ছিল। মদিনায় ৬২২ সালের পূর্বে কোনো সুসংগঠিত শাসন ব্যবস্থা ছিল না। মক্কার ন্যায় এখানেও গোত্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু গোত্রীয় শাসন ব্যবস্থার প্রতি এখানকার মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তাঁরা গোত্রীয় শাসন ব্যবস্থা থেকে নিষ্কৃতি চেয়ে মুহম্মদ (স.)কে মদিনার শাসক হবার আমন্ত্রণ জানায়। প্রকৃতপক্ষে মুহম্মদ (স.) অনেক দিন ধরেই ইসলাম প্রচারের জন্য নিরাপদ স্থান খুঁজছিলেন — এসময় তাঁর এমন একটি স্থান প্রয়োজন ছিল যেখানে তিনি নিরাপদে ইসলাম ধর্ম প্রচারের সুযোগ পাবেন — যেখানে তাঁর জীবনের নিরাপত্তা থাকবে। প্রকৃতপক্ষে এই মদিনা নগরই তাঁর উভয় চাহিদা পূরণের জন্য উপযুক্ত স্থান ছিল। অপরপক্ষে মদিনায় এমন একজন নেতার প্রয়োজন ছিল যিনি সৎ, নির্ভীক ও যোগ্য হবেন। মুহাম্মদ (স.)-এর মধ্যে মদিনাবাসীরা সততা, নির্ভীকতা, যোগ্যতার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলেন। মুহাম্মদ (স.) তাই মদিনাবাসীদের পক্ষ থেকে মদিনার শাসক হওয়ার আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করেন। মদিনাবাসীরা উদারতার

অধিকারী ছিলেন। তাঁরা তাঁদের নিজেদের নেতৃবৃন্দের ওপর আস্থাহীন হয়ে একজন বিদেশিকে তাঁদের শাসক হবার সুযোগ দিয়েছিলেন। যার মাধ্যমে তাঁরা এক অন্যবদ্য উদারতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। মুহম্মদ (স.) মদিনায় গোত্রীয় শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে মদিনা সনদের মাধ্যমে একটি উম্মাহ গঠন করেন এবং এই উম্মাহ গঠনের মাধ্যমে তিনি এক ধরনের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করেন — যেখানে প্রতিটি গোত্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথা নিয়মে নির্দিষ্ট করা ছিল (Watt : 221)। মদিনায় মুহম্মদ (স.) প্রকৃত নীতি নির্ধারক হয়ে উঠেছিলেন। মদিনা সনদের মাধ্যমে তিনি যে 'উম্মাহ' গঠন করেছিলেন, মদিনার উল্লেখযোগ্য সকল গোত্রবাদ সেই উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মদিনা সনদের মাধ্যমে গঠিত এই উম্মাহর অন্তর্গত সকল জনগোষ্ঠী মুহম্মহ (স.)কে উম্মাহ'র বিচারক হিসেবে সম্মানিত করেছিল। উক্ত সনদে উল্লেখ ছিল যে, সনদে স্বাক্ষরকারী পক্ষগুলোর মধ্যে যদি কোনো ধরনের দ্বন্দ-সংঘাত সৃষ্টি হয় তাহলে সংঘাতে লিপ্ত পক্ষসমূহ সেই সংঘাত মীমাংসার দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিতে পারবে না, বিবদমান পক্ষগুলো অবশ্যই বিরোধ মীমাংসা বা সংঘাত নিরসনের বিষয়টি মুহম্মদ (স.)-এর কাছে পেশ করবে। মদিনায় গিয়ে মদিনা সনদের মাধ্যমে মুহম্মদ (স.) সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে ওঠেন। জন্মভূমিতে লাঞ্ছিত মুহম্মদ (স.) ভিনদেশে সীমাহীন সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হন। মুহম্মদ (স.) মাতৃভূমিতে নিপীড়িত, আশ্রয়হীন হয়েছিলেন কিন্তু মদিনাবাসীরা তাঁকে শুধু আশ্রয়ই দেয়নি তাঁকে তাঁদের নগরী শাসনের সম্মানজনক সুকঠিন দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। নিজস্ব নেতাদের অসততায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাঁরা মুহম্মদ (স.)-এর ওপর অবিচল আস্থার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, যা মুহম্মদ (স.)-এর জীবনকে সার্থক করে তুলেছিল এবং একই সাথে এই বিষয়টি তাঁর জীবনের জন্য একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা ছিল। মদিনা সনদের মাধ্যমে মদিনার শাসক হবার বদৌলতে মুহম্মদ (স.) ইসলাম ধর্মকে প্রচার করার এক অপূর্ব সুযোগ লাভ করেন। মদিনা তাঁকে ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ দিয়েছিল- যেটা পূর্বে মক্কায় তাঁর পক্ষে পাওয়া অসম্ভব ছিল (Hitti : 116, Armstrong : 134)। মদিনা সনদের বিভিন্ন ধারায় প্রদত্ত অধিকার বলে মুহম্মদ (স.) মদিনায় প্রকৃত নীতি নির্ধারক হয়ে ওঠেন। এই সনদ তাঁকে এতটাই ক্ষমতাশালী করে যে মদিনা থেকে ইসলাম-বিরোধীদের চক্রান্ত নস্যাৎ করার আত্মবিশ্বাস ও ক্ষমতা খুব দ্রুত তিনি অর্জন করতে থাকেন।

মদিনা সনদে বলা হয়েছিল যে, যতদিন ইহুদিরা তাদের বিশ্বাস সমুন্নত রাখবেন ততদিন মুহম্মদ (স.) তাঁদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অটুট রাখবেন (Margoliouth, 2003 : 228)। ৬২৫ সালে মদিনার একটি প্রভাবশালী গোত্র বনু কাইনুকা গোত্র মুসলমানদের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিল। সেই সংঘাতে উক্ত গোত্রের একজন ইহুদি এবং একজন মুসলমানের মৃত্যু হয়। মদিনা সনদে উল্লেখ ছিল স্বাক্ষরকারী পক্ষগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের বিরোধ সৃষ্টি হলে বিবদমান পক্ষগুলো মুহম্মদ (স.)-এর কাছে বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব অর্পণ করবেন। কিন্তু উক্ত ইহুদি গোত্রটি একজন



মুসলমান কর্তৃক ইহুদি হত্যার বিষয়টি মুহম্মদ (স.)-এর কাছে বিচারের জন্য পেশ না করে নিজেরাই আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল এবং ঐ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ হিসেবে ঐ হত্যাকারী মুসলমানকে হত্যা করেছিল ফলে বনু কাইনুকা গোত্র কর্তৃক মদিনা সনদ লঙ্ঘিত হয়েছিল। মুহম্মদ (স.) তাদের বিরুদ্ধে মদিনা সনদের ধারা লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে তাদেরকে নির্বাসন দণ্ড প্রদান করেন। বনু কাইনুকা গোত্র পরে সিরিয়ার সীমান্তে বসতি স্থাপন করেছিল। কাইনুকা গোত্র মুহম্মদ (স.) কর্তৃক প্রদত্ত নির্বাসন দণ্ডের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ গড়তে তখন সম্ভব হয়নি। মদিনায় মুহম্মদ (স.)-এর ক্ষমতা ও পরাক্রম কীভাবে দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল — এই ঘটনাটি তাঁর একটি উদাহরণ (Lings : 162)। ৬২৫ সালে মদিনার আরেকটি পরাক্রমশালী ইহুদি গোত্র বনু নাদির গোত্রকে পরাজিত ও নির্বাসিত করা মুহম্মদ (স.)-এর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। ৬২৫ সালে বনু নাদির গোত্র মুহম্মদ (স.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। মুহম্মদ (স.)-এর উত্তরোত্তর ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হতে দেখে তাঁরা ক্রমান্বয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব হারানোর ভয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। তাঁর অগ্রগতি প্রতিহত করার জন্য তাঁরা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। মুহম্মদ (স.) তাঁর সুদক্ষ গুপ্তচর বাহিনী দ্বারা উক্ত গোত্রের ষড়যন্ত্রের কথা সময়মত অবহিত হতে পেরেছিলেন। তিনি এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর বনু নাদির গোত্রকে শান্তিপূর্ণভাবে দশ দিনের মধ্যে মদিনা ত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু নাদির গোত্র তাঁর নির্দেশ অমান্য করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। এই যুদ্ধে তাঁরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিল এবং মুহম্মদ (স.) তাদেরকে খায়বার (মদিনা থেকে ১৫০ কি.মি. দূরে অবস্থিত একটি উপত্যকা, এখানে প্রচুর খেজুর উৎপন্ন হত)-এ নির্বাসিত করেন। নাদির গোত্রকে মদিনা থেকে বহিষ্কারের পর মুহম্মদ (স.) আরও ক্ষমতাবান হয়ে ওঠেন। কারণ, বনু নাদির গোত্র মদিনার সর্বাধিক শক্তিশালী গোত্রসমূহের অন্যতম ছিল (Lings : 203)। এভাবে মদিনা তাঁকে ব্যাপক ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করেছিল। বায়ান্ন বছরের দীর্ঘ মক্কা জীবনে তিনি কখনই এতটা ক্ষমতা এবং প্রভাব অর্জন করতে সক্ষম হননি।

মদিনায় মুহাম্মদ (স.)-এর ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মক্কার ইসলাম-বিরোধী পৌত্তলিকরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে বিভিন্ন গোত্রের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিল। কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান-এর নেতৃত্বে সেই বাহিনীতে সর্বমোট দশ হাজার সৈন্যের সমাবেশ ঘটেছিল। খায়বারে নির্বাসিত নাদির গোত্রও এই বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। গোপনসূত্রে এই সৈন্যবাহিনীর আগমন সম্পর্কে মুহম্মদ (স.) যথাসময়ে জ্ঞাত হয়েছিলেন। ফলে তাঁর পক্ষে এই কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করা দুষ্কর হয়নি। এই বিশাল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে তাঁকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে হয়নি। তিনি তাঁর সামরিক উপদেষ্টা, যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ সালমান পারসিক-এর সমর কৌশলের ওপর আস্থাবান ছিলেন। সালমান এই যুদ্ধ-মোকাবেলায় এক নবতর যুদ্ধ কৌশলের ধারণা দেন। তিনি মদিনার প্রবেশ মুখে বিশাল আকৃতির পরিখা (Ditch)

খনন করে "সল" পাহাড়ের শীর্ষে সেনা শিবির স্থাপন করে সেখানে তীরন্দাজ বাহিনী নিযুক্ত করেন। সম্মিলিত বাহিনী মদিনার প্রবেশ পথে এসে বিশাল আকৃতির অনতিক্রম্য পরিখা দেখার পর দিশেহারা হয়ে পড়ে। শত্রুরা যতবার পরিখা অতিক্রম করার চেষ্টা করছিল ততবারই পাহাড়ের শীর্ষে নিযুক্ত তীরন্দাজ বাহিনী তাদের তীর নিক্ষেপ করছিল। ফলে এক সময় পরিখা অতিক্রম করার চেষ্টা বন্ধ হয়ে যায়। দুই সপ্তাহ ধরে কুরাইশ নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বাহিনী এবং মুহাম্মদ (স.)-এর নেতৃত্বাধীন বাহিনী পরিখার দুদিকে মুখোমুখি অবস্থান নিয়ে থাকে। ইতোমধ্যে প্রবল শৈত্যপ্রবাহ এবং আকস্মিক ঝড়ে আবু সুফিয়ানের বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং তাদের সেনা ছাউনী উড়ে যায়, ফলে আবু সুফিয়ানের বাহিনী বিপন্ন অবস্থায় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়। মুহম্মদ (স.) যুদ্ধ না করেও শত্রুর কবল থেকে মদিনাকে রক্ষা করেন। নবতর যুদ্ধ কৌশল মুহম্মদ (স.)কে মহান যোদ্ধার স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল। যুদ্ধে লিপ্ত না হয়েও একটি সম্মিলিত শক্তিশালী বাহিনীর আক্রমণ প্রচেষ্টাকে অকার্যকর করে দিয়ে, মদিনার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অটুট রেখে মুহম্মদ (স.) আরবে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সমর নেতায় পরিণত হন। এই জয়ের পর কুরাইশদের জাত্যভিমান, দাম্ভিকতা ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবি চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়। মদিনায় অবস্থান করে মক্কার কুরাইশ নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করে, তাদের ব্যবসা বাধাগ্রস্ত করে তিনি তাদের দম্ভ বিচূর্ণ করেছিলেন। এই অর্জন তাঁর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় প্রাপ্তি যোগ করেছিল। মদিনার প্রবেশ পথে বাধা সৃষ্টি করে সম্মিলিত বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার খবর যখন আরবে ছড়িয়ে পড়ে তখন তিনি সাফল্যের একটি উচ্চ স্তরে পৌঁছে যান। মক্কায় তিনি শুধু ধর্মপ্রচারক ছিলেন। কিন্তু মদিনা তাঁকে মহান সমর নেতার খ্যাতি এনে দিয়েছিল। এই যুদ্ধে পরাজিত হবার পর ইসলাম-বিরোধীরা বুঝতে পারে যে মুহম্মদ (স.) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে মদিনায় বিপুল শক্তি অর্জন করেছেন। যে মদিনা তাঁর নিজের দেশ নয়, সেই মদিনা ইসলাম-বিরোধীদের একটা চরম বার্তা দিয়েছিল যে, মুহম্মদ (স.) মদিনায় অজেয় শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। মদিনা থেকে তাঁকে এবং তাঁর মুসলিম সম্প্রদায়কে উৎখাত করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব নয় (Lings:215)। মদিনায় বনু কুরাইজা নামক আরও একটি শক্তিশালী গোত্র ছিল। যে গোত্রটি মদিনা সনদে স্বাক্ষর করেছিল। সনদের ধারা অনুযায়ী তাঁরা মদিনার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অংশ নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাঁরা পরিখার যুদ্ধের (৬২৭ সাল) সময় বিশ্বাসঘাতকতা করে। বিশ্বাসঘাতক কুরাইজা গোত্রকে মদিনার জন্য বিপদজনক বিবেচনা করে তিনি তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং ঐ যুদ্ধে তিনি কুরাইজা গোত্রকে পরাজিত করেন। তাদের বিশ্বাসঘাতকতার বিচার করার দায়িত্ব তিনি প্রদান করেন বনু আওস গোত্রের স'াদ ইবন মুয়াজকে। কুরাইজা গোত্রের অনুরোধেই স'াদ ইবন মুয়াজ বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পেয়েছিলেন। বিচারক এই গোত্রের সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সদস্যকে মতান্তরে অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সদস্যদের শিরশ্ছেদ করার এবং তাদের স্ত্রী, সন্তানদের বন্দি করার নির্দেশ দেন। বনু কুরাইজা গোত্রের এই



কঠোর দণ্ডের পর মদিনায় মুহম্মদ (স.)কে প্রতিহত করার মতো উল্লেখযোগ্য আর কোনো গোত্র ছিল না। এরপর থেকে মুহম্মদ (স.) মদিনায় এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। যে ইহুদি গোত্রগুলো মদিনা সনদের ধারা মান্য করেছিল, মুহম্মদ (স.) তাঁদের সাথে আমৃত্যু সোহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন (Glubb : 385)।

মুহম্মদ (স.)-এর জীবনে হুদায়বিয়ার সন্ধি ছিল একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সাফল্য — মদিনা তাঁর জীবনে এই অনবদ্য সাফল্য এনে দিয়েছিল। ৬২৮ সালে হুদায়বিয়া সন্ধির মাধ্যমে মুহম্মদ (স.) কুরাইশ-মুসলমানদের মধ্যে ১০ বছরের জন্য শান্তি চুক্তি সাক্ষর করেন। এই চুক্তির মাধ্যমে মক্কাবাসীরা কিছু শর্তের ভিত্তিতে মদিনাবাসীদের সাথে শান্তি সন্ধিতে আবদ্ধ হয়। ১০ বছরের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহে না জড়ানোর এই সন্ধিতে স্বাক্ষর করে মুহম্মদ (স.) তাঁর শান্তিকামী নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটান। তিনি এই চুক্তি মোতাবেক শান্তিপূর্ণভাবে মক্কায় ধর্ম প্রচার এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রের সাথে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। এই চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে তিনি একই সাথে ৬২৯ সালে মক্কায় প্রবেশের বহু প্রতীক্ষিত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেন। ৫-৬ বছর মক্কা থেকে মুসলমানরা বিচ্ছিন্ন থেকেছেন। মাতৃভূমিতে যাওয়ার জন্য মুসলমানদের হৃদয়ে হাহাকার সৃষ্টি হয়েছিল। এই চুক্তির মাধ্যমে তাঁরা মক্কায় যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। এর আগে কুরাইশরা মুসলমানদের ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। এই চুক্তির মাধ্যমে তাঁরা মুসলমানদের একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এই চুক্তির মাধ্যমে মুসলমানরা কিছু শর্তের অধীনে মদিনা থেকে মক্কায় গিয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচারের সুযোগ লাভ করেন। ফলে মুহম্মদ (স.) ধর্ম-প্রচারক হিসেবে পূর্বের তুলনায় অনুকূল পরিবেশ লাভ করেন এবং মদিনায় তিনি আরও শক্তিশালী অবস্থানে উপনীত হন। মদিনাবাসীর পক্ষে মুহম্মদ (স.) এই চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। অর্থাৎ মুহম্মদ (স.) এবং মদিনা এই সময় সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। মক্কা-মদিনার উত্তেজনা প্রশমনে এই চুক্তি বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছিল। মুহম্মদ (স.) যুদ্ধ পরিহার করে, কুটনীতির মাধ্যমে মদিনাবাসীদের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে মক্কা-মদিনার মধ্যে ১০ বছরের অনাক্রমণ চুক্তি করেন (Glubb, 2001 : 271)। এই চুক্তি তাঁর জীবনের এক উল্লেখযোগ্য বিজয় ছিল। পবিত্র কোরানের সুরা আল-ফাত (Al-Fath)-এ হুদায়বিয়া সন্ধিকে মুহম্মদ (স.)-এর জন্য একটি সুস্পষ্ট বিজয় হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে (al-Quran 48 : 1)। খাইবারে নির্বাসিত বনু নাদির গোত্র আরবের বিভিন্ন গোত্রকে মুহম্মদ (স.)-এর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল । মুহম্মদ (স.) এই যুদ্ধের প্রস্তুতি বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার পর তাঁদের দুর্গগুলি আক্রমণ করেন। যুদ্ধে ইহুদিদের আত্মসমর্পণের পর ইহুদিদের চাষের জমি তিনি ফিরিয়ে দেন। চুক্তি হিসেবে তাঁদের উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক কর হিসেবে প্রদান করার কথা বলা হয়। ফাদাক (মদিনা থেকে ১৪০ কি.মি. দূরবর্তী স্থান)-এর ইহুদিরাও একই রকম বন্দোবস্তে সম্মত হয়। তায়মা নামক ইহুদি গোত্রকেও তিনি কর দানের শর্তে সন্ধিসুত্রে আবদ্ধ করেন। মদিনা সনদ ইহুদিদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত

করেছিল। যে মদিনায় তিনি ৬ বছর আগে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই নব আগন্তুক মুহম্মদ (স.) মদিনার প্রবল পরাক্রমশালী ইহুদিদের যেভাবে পরাস্ত করেছিলেন, মদিনা সনদের ধারা লংঘন করার অপরাধে তিনি যেভাবে তাঁদের কঠোর শাস্তি প্রদান করেছিলেন এবং সেই শাস্তি ইহুদিরা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল — তাতে মদিনার শাসক হিসেবে তিনি যে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিলেন, সেই চরম বাস্তবতা সমগ্র আরব উপকূলে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছিল। ইহুদিরা উপলব্ধি করেছিল যে, মুহাম্মদ (স.)-এর বিরোধিতা করা একটি নিরর্থক বিষয়, তাঁরা গভীরভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিল যে তাঁরা যদি মুহম্মদ (স.)-এর বিরোধিতা পরিত্যাগ করেন, মদিনা সনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে মদিনাতে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করেন তাহলেই তাঁরা স্বস্তিময় জীবন লাভ করবেন এবং তাদের জীবন অধিকতর কল্যাণকর হবে — এই গভীর বাস্তববোধের কারণে মুহম্মদ (স.)-এর জীবদ্দশায় ইহুদিরা আর উল্লেখযোগ্য কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়নি। যেসব ইহুদি গোত্র মদিনা সনদ মান্য করেছিল, মদিনা সনদে স্বাক্ষরকারী পক্ষ হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন ছিল, তাঁদের সাথে মুহম্মদ (স.)-এর সম্পর্ক সর্বদা সোহার্দ্যপূর্ণ ছিল। মদিনা সনদ অমান্যকারী ইহুদি গোত্রকে কঠোর শাস্তি প্রদান এবং সনদ মান্যকারী ইহুদি গোত্রের সাথে তাঁর সোহার্দ্যমূলক সম্পর্ক শাসক হিসেবে তাঁর ন্যায়পরায়ণ শাসননীতির প্রকাশ ঘটিয়েছিল। মদিনায় তিনি প্রবল ক্ষমতাশালী ইহুদিদের সম্পর্কে নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত নেবার অভূতপূর্ব ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। তাঁর জীবনে মদিনার অবদান অপরিসীম ।

মক্কার শীর্ষ নেতা আবু সুফিয়ান মদিনা সনদের ধারা লঙ্ঘন করেছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি কুরাইশ ও মুসলমানদের যেকোনো গোত্রের সাথে মিত্রতা করার অধিকার দিয়েছিল। এই চুক্তির পর খুঁজা গোত্র মুহম্মদ (স.)-এর সাথে চুক্তি করেছিল, অপরদিকে বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে মিত্রতা চুক্তি করেছিল। এই সময় কুরাইশদের সাথে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ বনু বকর গোত্রের নেতা খুঁজা গোত্রকে আক্রমণ করে — যে খুঁজা গোত্র মুহম্মদ (স.) এর সাথে মিত্রতাবদ্ধ ছিল, কুরাইশ নেতা আবু-সুফিয়ান এই আক্রমণে সহায়তা করেন। ফলে হুদায়বিয়ার সন্ধি লঙ্ঘিত হয়। খুঁজা গোত্র মদিনায় গিয়ে মুহম্মদ (স.)-এর কাছে বনু বকর গোত্র এবং তাদের মিত্র কুরাইশদের বিরুদ্ধে সন্ধি ভঙ্গের অভিযোগ করেন। আবু-সুফিয়ান মুহম্মদ (স.)-এর প্রতি চরমভাবে শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এই সময় তিনি তার ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকে কিছু হঠকারী কার্যকলাপ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আবু-সুফিয়ান ব্যক্তিগতভাবে মুহম্মদ (স.)-এর প্রতি এই সময় চরম বিদ্বেষ পোষণ করছিলেন। বিষয়টি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা অত্যাবশ্যক । আবু-সুফিয়ান মক্কার কুরাইশদের শীর্ষ নেতা ছিলেন। তাঁর কন্যার নাম ছিল উম্মে হাবিবা। মুহম্মদ (স.) যখন ইসলাম প্রচার শুরু করেন, তখন ইসলামের মানবতার বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে আবু-সুফিয়ান-এর কন্যা হাবিবা ও তাঁর স্বামী



ওবায়দুল্লাহ ইসলামে দীক্ষিত হন। মক্কায় ইসলাম-বিরোধীদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ৬১৫ সালে ৮৩টি মুসলিম পরিবার আবিসিনিয়া (বর্তমান ইথিওপিয়া)-য় শরণার্থী হিসেবে গমন করতে বাধ্য হয়েছিল। কেননা আবিসিনিয়ার শাসক নাজ্জাশী সকল ধর্মমতের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। হাবিবা-ওবায়দুল্লাহ দম্পতি উক্ত ৮৩টি শরণার্থী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তুলনামূলক উত্তম জীবনের আশায় তাঁরা আবিসিনিয়ায় গমন করেছিলেন। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের দাম্পত্য জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। হাবিবা-র স্বামী ওবায়দুল্লাহ সেখানে চারিত্রিকভাবে অধঃপতিত হন এবং চরমভাবে মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়েন। তিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে এক সময় ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেন। পরে মাদকাসক্তিজনিত দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তিনি সেখানেই মৃত্যু বরণ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর ৩৬-৩৭ বছর বয়সী হাবিবা দুই সন্তান নিয়ে দুঃসহ জীবন যাপন করছিলেন। হাবিবা-র মতো ত্যাগী মুসলিম নারীকে আবু-সুফিয়ান-এর প্রভাব বলয় থেকে রক্ষা করতে মুহম্মদ (স.) ৬২৮ সালে হাবিবাকে বিবাহ করে তাঁকে বিপদমুক্ত করেন। এই বিয়ের সংবাদ আবু-সুফিয়ান যখন জানতে পারেন তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন। আবু সুফিয়ান তাঁর কন্যা হাবিবার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু হাবিবা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। তাঁর কন্যা মুহম্মদ (স.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে — এই সংবাদ তাকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল এবং তিনি মুহম্মদ (স.)-এর ক্ষতি সাধনের জন্য হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলেন। যে মুহম্মদ (স.) কে তিনি তাঁর প্রধান শত্রু হিসেবে বিবেচনা করতেন সেই মুহম্মদ (স.)-এর সাথে তাঁর কন্যা হাবিবা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে — এই বিষয়টিকে আবু সুফিয়ান তাঁর জন্য বিব্রতকর, চরম পরাজয়, সম্মানহানিকর ও গ্লানির বিষয় হিসেবে মনে করেছিলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে হুদায়বিয়া সন্ধি লঙ্ঘন করার মতো অবিমৃষ্যকারী সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর মিত্র গোত্র বনু বকর গোত্রকে উস্কানি দেন যে তাঁরা যেন মুহম্মদ (স.)-এর মিত্র গোত্র খু'জা গোত্রকে রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করে। তাঁর উস্কানি ও সহায়তায় বনু বকর গোত্র যখন খুঁজা গোত্রকে আক্রমণ করেছিল তখন হুদায়বিয়া সন্ধি লঙ্ঘিত হয়েছিল। কেননা এই সন্ধিতে বলা হয়েছিল কুরাইশ ও তাঁর মিত্র গোত্রসমূহ এবং মুহম্মদ (স.) ও তাঁর মিত্র গোত্রসমূহ ১০ বছরের জন্য কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না (Watt : 32, Lings : 291)। যে চুক্তি মুসলমান তথা তাদের মিত্রদের এবং কুরাইশ বংশ এবং তাদের মিত্রদের দীর্ঘদিনের তিক্ত সম্পর্ককে সোহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল, যে চুক্তির ফলে ঐ সন্ধিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ স্বস্তিময় জীবন লাভ করেছিল, যে চুক্তির বদৌলতে মুহম্মদ (স.) সিরিয়ার বাণিজ্য পথ কুরাইশ বণিকদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, যে চুক্তি মক্কায় ইসলাম ধর্ম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল এবং মক্কা ও মদিনায় ১০ বছরের জন্য নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধবিহীন, শান্তিময় পরিবেশ বজায় রাখার নিশ্চয়তা প্রদান করেছিল, প্রতিহিংসা-

পরায়ণ আবু-সুফিয়ান সেই হুদায়বিয়া সন্ধি ভঙ্গ করে মুহম্মদ (স.) তথা তাঁর প্রচারিত ধর্মমতের উত্তরোত্তর প্রসারকে বাধাগ্রস্ত করতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মুহম্মদ (স.)-এর সাথে তাঁর কন্যা হাবিবা-র বিবাহের বিষয়টি তিনি মেনে নিতে পারেননি। ফলে তিনি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর এই প্রতিশোধ পরায়ণতা, উস্কানি, সন্ধি ভঙ্গের হঠকারিতা খুব দ্রুতই যে তাঁর পতনকে ত্বরান্বিত করবে, ক্রুদ্ধ আবু-সুফিয়ান এই চরম বাস্তবতা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই সন্ধি দ্বারা মুহম্মদ (স.) তাঁর অনুসারীদের সাথে মক্কার কুরাইশদের বিরোধের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন কিন্তু আবু-সুফিয়ান এই সন্ধি ভঙ্গ করার পর তিনি আবু-সুফিয়ানকে ক্ষমা করতে পারেননি। তিনি হুদায়বিয়া সন্ধি লঙ্ঘন-এর সাথে আবু-সুফিয়ান-এর সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়ার পর মক্কা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। ৬৩০ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে মক্কা আক্রমণের উদ্দেশ্যে তিনি মক্কার উপকণ্ঠে শিবির স্থাপন করেন (Watt, 1956 : 65)। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শান্তি লঙ্ঘনকারী, সন্ধি ভঙ্গকারী আবু-সুফিয়ানকে শাস্তি প্রদান করা এবং তাঁর হাত থেকে মক্কার নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নিয়ে মক্কায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি দেখে আবু-সুফিয়ান আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং মুহম্মদ (স.)-এর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। অতঃপর তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। মক্কার শীর্ষ নেতা আবু সুফিয়ান যখন মদিনার শাসক মুহম্মদ (স.)-এর কাছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন তখন আবু-সুফিয়ানের অনুসারীরাও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইসলামে দীক্ষিত হয়। তাঁরা ইসলামকে ভালোবেসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। তাঁরা মুহম্মদ (স.)-এর অপরিসীম ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। মাত্র ৮ বছরের ব্যবধানে মদিনা তাঁকে শক্তিশালী, অপ্রতিরোধ্য এক মহান ধর্মপ্রচারক ও ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। মদিনা তাঁকে ব্যাপক ক্ষমতাশালী শাসক হওয়ার জন্য এক অভাবিত অনুকূল পরিবেশ প্রদান করেছিল। মক্কা বিজয় মুহম্মদ (স.)-এর জীবনের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সফলতা — এক্ষেত্রেও মুহম্মদ (স.)-এর জীবনে মদিনার গুরুত্ব অপরিসীম কেননা মদিনায় তিনি এতটাই প্রভাবশালী শাসকে পরিণত হয়েছিলেন যে তাঁর পক্ষে মদিনা থেকে মক্কায় গিয়ে মক্কা জয় করা সম্ভব হয়েছিল। মুহম্মদ (স.) যেভাবে মদিনা থেকে মক্কায় গিয়ে বিনা রক্তপাতে মক্কা জয় করেছিলেন এবং মক্কাবাসীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করেছিলেন তাতে তাঁর সীমাহীন মহানুভবতা এবং ক্ষমাশীলতার প্রকাশ ঘটেছিল। তাঁর শান্তিবাদী মনোভাবের কথা এমনভাবে আরবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে অনেক গোত্র তাঁর মানবিক নীতি প্রত্যক্ষ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। অনেকে ধর্ম বিশ্বাসের জন্য না হলেও তাঁর প্রতিষ্ঠিত সুশাসনের সুফল ভোগ করার জন্য তাঁর অধীনতা মেনে নিয়েছিল। ৬২৯ সাল পর্যন্ত তিনি শুধু মদিনার শাসক ছিলেন। ৬৩০ সালের জানুয়ারিতে মক্কা বিজয়ের পরে তিনি মক্কার শাসক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। যেটি ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের একটি অনন্যসাধারণ অর্জন।



৬৩০ সালেই তাঁকে মদিনা থেকে হুনায়ন-এর যুদ্ধে (মক্কা ও তায়েফ নগরীর মধ্যবর্তী একটি স্থান) শত্রুদের মোকাবেলা করতে হয়েছিল। মুহম্মদ (স.) যখন মক্কা বিজয়ের নানাবিধ বিষয় নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তখন হাওয়াজিন ও থাকিফ গোত্র মুহম্মদ (স.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মদিনায় মুহম্মদ (স.) চৌকস গুপ্তচর বাহিনী গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন — যারা ঠিক সময়ে তাঁকে শত্রু পক্ষের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে সংবাদ প্রেরণ করত। তাঁর ১২ হাজার সৈন্যের সুদক্ষ বাহিনী শত্রুপক্ষের ২০ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। মুহম্মদ (স.) তাঁর অভ্রান্ত যুদ্ধনীতির মাধ্যমে এই অসম যুদ্ধেও বিজয়ী হয়েছিলেন। এই যুদ্ধের পর আর কোনো বেদুইন আরব গোত্র মুহম্মদ (স.)-এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেনি। তাঁরা অবশেষে উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে মুহম্মদ (স.)-এর বিরুদ্ধাচারণ করা একটি নিরর্থক প্রয়াস মাত্র (Tabari : 101, Guillaume : 130, Glubb : 317, Lings : 304, Armstrong : 110, কাসীর : ৯১)।

নবম হিজরীকে (৬৩০ -৬৩১ সাল) মুহম্মদ (স.)-এর জীবনে প্রতিনিধি প্রেরণের বছর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই সময় আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন বেদুইন গোত্রের দূতরা মদিনায় এসে মুহম্মদ (স.)-এর সাথে বিভিন্ন ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর শাসন কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এই উপলক্ষ্যে অনেকেই এসময় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, অনেকেই শুধু রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন করেন। আকাবা উপসাগরের নিকটবর্তী স্থানে বসবাসরত খ্রিষ্টান 'আয়লা' সম্প্রদায় এর প্রধান শাসনকর্তা যুহান্না ইবন রুবা তাঁর সাথে সন্ধিতে আবদ্ধ হন, তাঁরা তাঁকে বাৎসরিক ৩০০ দিনার জিজিয়া প্রদান করতে সম্মত হয়। মুহম্মদ (স.) তাঁর ইসলাম ধর্মের বিধানগুলো নবদীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে প্রতিনিধি দলগুলোর সাথে ধর্মজ্ঞানীদের প্রেরণ করেন। উল্লেখ্য, ওমান, হাজরামাউথ ও ইয়েমন থেকে প্রতিনিধিরা মদিনায় এসে মুহম্মদ (স.)-এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। মদিনার শাসক মুহম্মদ (স.) এই সময় সাফল্যের উচ্চ শিখরে আরোহন করেছিলেন। মদিনা সনদের মাধ্যমে মদিনায় তিনি যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সুশৃঙ্খল, শান্তিবাদী শাসন ব্যবস্থার প্রতি আরবের মানুষের গভীর আস্থা সৃষ্টি হয়েছিল (Guillaume : 627)।

মদিনাবাসীদের অপূর্ব আতিথেয়তা ও মহানুভবতায় মদিনায় হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নতুন জীবন শুরু হয়েছিল। মাত্র ১০ বছর স্থায়ী মদিনা জীবনে তিনি ধর্ম প্রচারক ও শাসক হিসেবে অভাবিত সাফল্য অর্জন করেন। মুহম্মদ (স.)-এর এই বিস্ময়কর প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের বিষয়টি শুরু হয়েছিল মদিনা গমনের পর থেকে। তাঁর বিপুল কর্মযজ্ঞের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল মদিনা। ৬৩০ সালে মক্কা জয় করার পরও তিনি মাতৃভূমি মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফিরে যাননি। কেননা মাত্র ৮ বছরের মধ্যে মদিনা তাঁর জীবনের গতিপথ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। মদিনা থেকে ইসলাম ধর্মকে মদিনার বাইরে বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।

তিনি মদিনার সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের সাথে শান্তিময় সহাবস্থানের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ধীরে ধীরে মদিনা থেকে তিনি তাঁর শাসন ক্ষমতার পরিসর বৃদ্ধি করেছিলেন। মদিনা থেকে তিনি দুঃসাহসিক সামাজিক সংস্কার সাধন করেছিলেন। মদিনা তাঁর জীবনকে শুধু ধর্মপ্রচারক হিসেবে নয়, রাজনীতিবিদ তথা শাসক হিসেবে এবং সমাজ সংস্কারক হিসেবে তাঁর জীবনকে সার্থক করে তুলেছিল। ৫২ বছরের মক্কা জীবনে তিনি ছিলেন শুধুই ধর্ম প্রচারক কিন্তু মাত্র ১০ বছরের মদিনা জীবনে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সার্থক ধর্ম প্রচারক, সফল শাসক এবং সমাজ সংস্কারক। মদিনা সনদের মাধ্যমে তিনি অস্থিতিশীল মদিনায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনয়নে সক্ষম হন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় যেসব অঞ্চল জয় করেন সেসব অঞ্চলে বিস্ময়কর সাংগঠনিক দক্ষতার মাধ্যমে তিনি একটি মানবিক সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। ৬২ বছর জীবনকালের ৫২ বছর তিনি অতিবাহিত করেন মাতৃভূমি মক্কায়। এই ৫২ বছরের চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাঁর জীবন ছিল একজন সাধারণ মানুষের জীবন। এসময় মক্কায় তিনি পরিচিত ছিলেন একজন সৎ, সত্যবাদী, মহৎপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবে, তিনি মক্কায় পরিচিত ছিলেন হাশিম গোত্রের গোত্রপতি মহান আবু-তালিবের প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র হিসেবে এবং মক্কার অন্যতম বিত্তশালী, প্রভাবশালী ব্যবসায়ী হযরত খাদিজা (রা.)-এর জীবন-সঙ্গী হিসেবে। ৬১৩ থেকে ৬২২ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ মদিনায় হিজরতের আগ পর্যন্ত তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে মক্কার একজন নির্যাতিত, যন্ত্রণাদগ্ধ ধর্মপ্রচারক হিসেবে। ৬২২ সালে মদিনার দুটি প্রভাবশালী গোত্রের আমন্ত্রণে তিনি মদিনায় গমন করেন — এ সময় থেকে তাঁর মদিনা জীবনের সূচনা হয়েছিল। এ সময় থেকে ইসলাম ধর্মের অগ্রযাত্রাও শুরু হয়েছিল। মক্কা নয়, মদিনা থেকেই ইসলাম ধর্মের অপ্রতিরোধ্য যাত্রা শুরু হয়। মক্কায় তিনি ছিলেন শুধুই একজন ধর্মপ্রচারক, মদিনায় তিনি হয়ে ওঠেন একাধারে ধর্মপ্রচারক, আইন প্রণয়নকারী, প্রধান বিচারক, সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, সমাজসংস্কারক এবং সর্বোপরি মদিনার অবিসংবাদিত শাসক। বিপুল কর্মযজ্ঞ, ব্যাপক প্রভাব-প্রতিপত্তি, অনন্যসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা, ব্যাপক সাফল্য এবং ইসলাম ধর্মের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার কারণে মাত্র ১০ বছরের মদিনা জীবন তাঁর ৫২ বছরের দীর্ঘ মক্কা জীবনকে সবদিক দিয়ে অতিক্রম করে গিয়েছিল । রক্তপাতহীন মক্কা বিজয়ের গৌরব অর্জনের পর মক্কাবাসীদের প্রতি ক্ষমা ও মহানুভবতার অপূর্ব আদর্শ স্থাপন করে তিনি ফিরে এসেছিলেন মদিনায়। তাঁর জীবন তখন মদিনাকেন্দ্রিক হওয়ায় মাতৃভূমি মক্কায় ফিরে গিয়ে স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস করা আর সম্ভব ছিল না। তাঁর ধর্মপ্রচার এবং শাসনব্যবস্থা পরিচালনার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল মদিনা। ৬২২ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর জীবন, বিপুল কর্মযজ্ঞ সবকিছু মদিনাকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল। ন্যায় বিচার এবং মহানুভবতার ভিত্তিতে মদিনায় তিনি যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য কল্যাণকামী শাসনের উদাহরণ হয়ে আছে। তাঁর জীবনে মদিনার গুরুত্ব অপরিসীম, মদিনা সনদের মাধ্যমে মদিনায় তিনি যে উম্মাহ গঠন করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর সেই উম্মাহই মদিনায় খিলাফতের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।



## গ্রন্থপঞ্জি


Guillaume, Alfred, 1955. *The Life of Muhammad, A Translation of IBN Ishq's Sirat Rasul Allah,*Oxford University Press, London.

Armstrong, Karen, *Muhammad, A Biography of the Prophet,* A Phoenix press paperback, First published in Great Britain by Victor Gollancz in 1991. This Paperback edition published in 2001 by Phoenix Press, a division of The Orion Publishing Group Ltd, Orion House, 5, Upper St Martin's Lane, London WC2H 9EA.

Watt, W. Montgomery, 1953. *Muhammad at Mecca*, Oxford University Press, Ely House, London.

Watt, W, Montgomery, *Muhammad at Medina*, Oxford University Press, Amen House, London.

The History of al-Tabari (Ta'rikh al-rusul wa'l- muluk) Volume-VI, Muhammad at Mecca, translated and annotated by W. Montgomery Watt. University of Edinburgh, Emeritus and M.V. McDonald, University of Edinburgh, State University of New York Press, Albany, 1988.

Lings, Martin, 1983. Muhammad: His life Based on The Earliest Sources, Vikas Publishing House pvt. Ltd, 5 Ansari Road, New Delhi 1100002; The Islamic Texts Society, 66 Lincoin's Inn Fields, London WC2A3LH.

Hitti, P, K, 1958. *History of the Arabs*, Macmillan and Co Ltd, London.

Margoliouth, D. S. Mohammed and the rise of Islam, third edition, g.p.putnam's sons, New York and London, The Knickerbocker Press.

Glubb, John Bagot. 2001. *The Life and Times of Muhammad*, Hodder and Stoughton Limited, St. Paul's House, Compton Printing Ltd. London.

Muir, William, 1861. *The Life of Mahomet*, Smith Elder and Co., 65, Cornhill, London, Al-Quran 48:1.

আবুল ফিদা হাফিজ ইবন কাসীর আদ-দামেশকী (রা.), ২০০০। *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রকাশক : আব্দুস সালাম খাঁন পাঠান, পরিচালক অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।